অপারেশন ব্ল্যাক স্কোয়াড - অজেয় রায়
Operation Black Squad - Ajeo Ray

ঠক ঠক ঠক-দরজায় তিনবার টোকার শব্দ।

-কে?

আমি। দরজার বাইরে থেকে জবাব আসে।

এসো!—আহ্বান জানালেন চেয়ারম্যান।

ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন ব্যুরো অফ ইন্টেলিজেন্সের প্রধান। লম্বা, পেটানো চেহারা তার। একটু চাপা নাক। দু'চোখে সতর্ক দৃষ্টি।

মস্ত এক টেবিল, তার পিছনে বসে চেয়ারম্যান! মাথার চুল ধবধবে সাদা। ঈষৎ লম্বাটে ভাঁজ পড়া মুখ। সাদা, খাড়া নাক। মোটা ফ্রেমের চশমার পিছনে তার উজ্জ্বল চোখ। টেবিল ল্যাম্পের জোরালো আলোর নিচে কয়েকটি জরুরি ফাইল খোলা অবস্থায় রয়েছে।

বসো চিফ। হাতের ফাইলটা ড্রয়ারের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন চেয়ারম্যান। চিফ বসলেন চেয়ারম্যানের মুখোমুখি চেয়ারটিতে।

চিঠিটা দেখ।– চেয়ারম্যান পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে একটা সাধারণ খাম বের করে চিফের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

খাম খোলাই ছিল। ভিতর থেকে বেরুল একটি চিরকুট। সাদা কাগজে ইংরিজি টাইপে লেখা দু'টি লাইন পনেরোই ডিসেম্বরের সভা সম্বন্ধে সাবধান। প্রাণ সংশয় হতে পারে।

ব্যস। কে লিখেছে, কোথা থেকে, কোনো হদিশই নেই। খামটা পরীক্ষা করলেন চিফ। ডাকঘরের ছাপ দেখে বোঝা যায় এই শহরেরই এক জায়গায় পোস্ট করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে চেয়ারম্যান একটি ফাইলে চোখ বোলাতে শুরু করেছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল চিফ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফাইল বন্ধ করে চেয়ারম্যান বললেন, কী বুঝলে?

—ওয়ার্নিং।

ধাপ্পাও হতে পারে।

—তা পারে। তবে -

বেশ, ধরা যাক সত্যি খবর।

বিপদটা কার কাছ থেকে আসবে মনে হয়?

একটু ভাবলেন চিফ। তারপর উচ্চারণ করলেন, —ব্ল্যাক স্কোয়াড।

—হুঁ, তাই মনে হয়। আমার উপরই ওদের সব চেয়ে আক্রোশ।

চেয়ারম্যানের কথা শুনে চিফের মনে পড়ে যায় ব্ল্যাক স্কোয়াডের পুরনো সব রেকর্ড।

ব্ল্যাক স্কোয়াড একটি গুপ্ত দল। এই দলটা তৈরি হয়েছে বছর চারেক আগে। নানা রকম গোপন ব্যবসা এবং বেআইনি পথে প্রচুর টাকা রোজগার এই দলের উদ্দেশ্য। কার্য সিদ্ধি করতে তারা অনায়াসে খুন-জখমও করত। ক্রমে এদের লোভ বাড়ে, দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের দিকে হাত বাড়ায়।

দু বছর আগে চেয়ারম্যানের দল দেশ শাসনের অধিকার পায়। কিছুকাল পরেই তারা তস্কোয়াডের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করে। বেআইনি কাজকর্মের অভিযোগে এদের কিছ চাই গ্রেফতারও হয়। জেলে যায়। দলটা এখন প্রায় বসে গিয়েছে। চিফ জানতেন কাক স্কোয়াডের বিরুদ্ধে সরকারি প্রশাসনের তৎপরতার পিছনে রয়েছে আসলে চেয়ারম্যানের হাত। আর ব্ল্যাক স্কোয়াডও এতদিনে সে খবর পেয়ে গিয়েছে।

চেয়ারম্যান বলেন, হয়তো জানো, তিন দিন আগে একটা জরুরি গোপন মিটিং হয়েছিল। মিটিং-এই ঠিক হয় যে ব্ল্যাক স্কোয়াডকে এবার পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলতে হবে। ব্ল্যাক স্কোয়াডকে চূর্ণ করার জন্য আমিই বেশি জোর দিই। বোঝা যাচ্ছে মিটিং-এর সিদ্ধান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তাই ওরা আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। জানে আমায় সরাতে পারলে ওরা অনেকখানি নিশ্চিন্ত হবে। হয়তো আমার কোনো উপকারী বন্ধু এই চিঠি দিয়ে গোপনে সাবধান করতে চেয়েছে আমায়, অবশ্য চিঠিটা যদি না ধাপ্পা হয়।

যদি সে দিন সভায় না যান? যদি রটিয়ে দেন আপনার শরীর অসুস্থ?—বললেন চিফ।

—সভায় আমায় যেতেই হবে। সেদিন আমাদের দলের কিছু নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করতে চাই। আমি না গেলে সে ঘঘাষণা হবে অন্য কারও মুখ থেকে। তাতে দলে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে।

তাছাড়া ভয়ের কাছে কখনও আমি মাথা নিচু করিনি। এর আগে বার বার আমার কাছে উড়ো চিঠি এসেছে নানা কারণে—প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে। আমি পিছছাইনি। দু'বার সত্যিই আক্রমণ এসেছিল। এই দেখ গালে কাটা দাগ। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল গুলিটা। আর একবার গায়ে লাগেনি। আর কেউ যদি এই ভাবে ধাপ্পা দিয়ে আমার ওই সভায় যাওয়া বন্ধ করতে চায় বা আমায় বোকা বানাতে চায়, সে মতলবও পূরণ হবে না। সুস্থ থাকলে সভায় আমি যাবই। তবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করব বইকি। সেই জন্যই তোমায় ডেকেছি।

চিফ চুপ করে তাকিয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে চেয়ারম্যানের কী নির্দেশ হয় সেটা আগে শোনা ভালো।

চেয়ারম্যান বললেন, "শোনো চিফ, আমার ধারণা তিন দিন আগের গোপন মিটিং-এর সিদ্ধান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর ব্ল্যাক স্কোয়াড মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই খবর বেরুল কী করে? যাঁরা সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন সকলেই উঁচু পদের লোক এবং আমাদের বিশ্বাসভাজন। তবে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত? এদের কি কেউ ব্ল্যাক স্কোয়াডের লোক?

চারদিন সময় দিচ্ছি তোমায়। খুজে দেখ ওদের মধ্যে কাকে কাকে তোমার সন্দেহ হয়। তারপর ভাবা যাবে আত্মরক্ষার উপায়! হা, এই চিঠি বা তোমার সঙ্গে আমার এই আলোচনার কথা যেন কেউ না জানতে পারে। কে যে বিশ্বাসঘাতক জানি না। আমার বন্ধুরা হয়তো অতিরিক্ত উত্তেজনায় ফাস করে দেবে চিঠির কথা। যদি সত্যি আক্রমণ আসে এই সুযোগ। আমরা সতর্ক থাকলে আক্রমণকারীদের ধরে ফেলতে পারবে। জানতে পারব এর অন্য সভ্যদের হদিশ। ভাগ্যে থাকলে মাথাটিকেও ধরে ফেলতে পারি। তাহলে ব্ল্যাক স্কোয়াডকে উৎখাত করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

চিফ অবাক হয়ে ভাবেন। চেয়ারম্যান সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা গভীর। এই মানুষটির দুর্দান্ত সাহসের অনেক গল্প তিনি শুনেছেন। এবার হাতে নাতে প্রমাণ পেলেন। নিজের জীবনকে টোপ ফেলেও শত্রুকে ঘায়েল করতে পিছপা নন। যদি চিঠির কথা সত্যি হয়? এত বড় বিপদের ঝুঁকি?

নিজেকে খুব অসহায় লাগে চিফের। তিনি আমতা আমতা করেন,—এতখানি রিস্ক! যদি কিছু... | চেয়ারম্যান থামিয়ে দেন, "জানি জানি। এও জানি, তিন মাস আগে আমাদের পূর্ব অঞ্চলের পার্টির সেক্রেটারি এদের হাতেই খুন হয়েছে বলে, সন্দেহ। যদিও কাউকে ধরা যায়নি। ব্ল্যাক স্কোয়াডের ব্যাপারে ওই সেক্রেটারি ছিল আমার সাপোর্টার। তাই এদের ধ্বংস করতেই হবে। আর এই হচ্ছে ফাঁদ।

চিফ চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক বাদেই চেয়ারম্যান টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেন।

-হ্যালো! কে প্রফেসর? আমি চেয়ারম্যান বলছি। একবার আসতে পারবেন আমার বাড়িতে? এখুনি! খুব দরকার। নইলে আমিই যেতে পারি। ও-তুমিই আসবে? ধন্যবাদ!

চেয়ারম্যান প্রফেসর বলে যাকে সম্বোধন করলেন তিনি হচ্ছেন ইনস্টিটিউট অফ কম্পিউটার সেন্টারের ডিরেক্টর। তরুণ বয়সে চেয়ারম্যান ও তিনি কিছুকাল একই কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর দুজনের জীবনপথ আলাদা হয়ে যায়। চেয়ারম্যান ঝাপিয়ে পড়েন রাজনীতিতে। আর প্রফেসরও ছাত্র পড়ানোর চেয়ে গবেষণার কাজেই বেশি মন দেন। তবু দু'জনের বন্ধুত্বটা অটুট রয়েছে। দু'জনেই নিজের ক্ষেত্রে আজ বিখ্যাত। এখন পরস্পরের সম্বোধনটা দাঁড়িয়েছে প্রফেসর এবং চেয়ারম্যান। খাতিরের ডাক নয়, মজা করে ডাকা।

আধঘন্টার ভিতরেই প্রফেসর চেয়ারম্যানের কাছে হাজির হলেন। প্রফেসর চেয়ারম্যানের মতন লম্বা রোগা নন। কিঞ্চিৎ খর্বকায় ও গাট্টাগোট্টা। গোল মুখ। এলোমলো কাঁচাপাকা চুল। চলাফেরা যুবকের মতো চটপটে। চেয়ারম্যানের সামনের চেয়ারে বসেই প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

-কী খাবে? চা না কফি?

কিছু না। কী ব্যাপার বলো?

ধীরে ধীরে বলেন চেয়ারম্যান,—মনে আছে দু বছর আগে আমার লাইফের উপর একটা অ্যাটেম্পট হয়। অল্পের জন্য সেবার বেঁচে গেলাম।

খুব মনে আছে। একদিন এইভাবেই মরবে। যা একখানা লাইন বেছে নিয়েছ। বন্ধুর জীবনের চিন্তায় প্রফেসর বেশ ক্ষুব্ধ। হাসলেন চেয়ারম্যান, মনে আছে সেবার একটা প্রস্তাব দিয়েছিলে? -খুব মনে আছে। তুমি তো কানই দিলে না। —সে ব্যবস্থা এখন সম্ভব?

কেন নয়?—তারপর বেশ আশ্চর্য হয়ে প্রফেসর বললেন: হঠাৎ অ্যাদ্দিন বাদে?

চেয়ারম্যান বুক পকেট থেকে খাম বেরল করে খুলে চিরকুটটি এগিয়ে দিলেন প্রফেসরকে। চারদিন পরে। রাত সোয়া সাতটা। ঠক ঠক ঠক-দরজায় তিনবার টোকা পড়ল।

কে?—প্রশ্ন করলেন, চেয়ারম্যান।

উত্তর এল, আমি।

এসো। -ডাকলেন চেয়ারম্যান।

ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন চিফ। গিয়ে বসলেন চেয়ারম্যানের মুখোমুখি টেবিলের অন্য ধারের চেয়ারে।

কী খবর পেলে বলো। -চেয়ারম্যান সোজাসুজি কাজের কথায় আসেন।

কথা বলতে গিয়ে ইতস্তত করেন চিফ। তারপর ঝট করে পকেট থেকে নোট বই বের করে একটা পাতা ছিড়ে পেন দিয়ে একটা নাম লিখে এগিয়ে দিলেন চেয়ারম্যানের হাতে।

চেয়ারম্যান কাগজে চোখ বুলিয়ে ভুরু কুঁচকালেন। এই ভয়টাই করছিলেন চিফ। চেয়ারম্যান হয়তো বিশ্বাসই করবেন না তার কথা। কারণ সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি একজন উচু পদের সরকারি কর্মচারী এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে এর খুবই খাতির।

প্রমাণ? -চেয়ারম্যানের প্রশ্ন!

সে রকম প্রমাণ এখনই দিতে পারব না! তবে এর পুরনো রেকর্ড দেখে আমার মনে হয়েছে।স্পষ্ট গলায় জানালেন চিফ।

ই, ঠিক আছে। দেখা যাক। চেয়ারম্যান মুখ নিচু করে চিন্তা করলেন ইনি সভায় বসবেন কোথায়?

—মঞ্চের পাশেই ভিআইপি এনক্লোজারে। বেশ। কুটি কুটি করে কাগজটা ছিড়ে ফেললেন চেয়ারম্যান।

এক মিনিট। দরজায় ছিটকিনি দিয়ে ফিরে এলেন চেয়ারম্যান: চারজন বিশ্বাসী লোক দিতে পারবে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে? খুব বিশ্বাসী হওয়া চাই।

একটু ভেবে চিফ বললেন, পারব।

—বেশ, এবার যা বলছি শোননা। সেদিনকার সভায় আমার সিকিউরিটির জন্য কোনো বাড়াবাড়ির দরকার নেই। যা অন্যবার হয়ে থাকে, ব্যস, সেইটুকু। ব্ল্যাক স্কোয়াড যেন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করে আমরা কিছু টের পেয়েছি।

পনেরোই ডিসেম্বর। দুপুর তিনটে। সভা আরম্ভ হতে আর সামান্য বাকি। হু হু করে বইছে হিমেল হাওয়া।

বিশাল জনসমুদ্রের সামনে বক্তৃতা মঞ্চ। প্রায় দশ বারো ফুট উঁচু। সেখানে বসেছেন মন্ত্রীরা। এবং পার্টির কয়েকজন প্রথম সারির নেতা।

প্রধান বক্তৃতা মঞ্চের একপাশে মাটি থেকে দু ফুট উঁচু করে পাটাতন ফেলে অনেকখানি বসবার জায়গা। সেখানে বসছেন পার্টির ছোটখাটো নেতা, কিছু উঁচু পদের সরকারি আমলা ও কিছু গণ্যমান্য নাগরিক। এরা বসেছেন বক্তৃতা মঞ্চের দিকে মুখ করে দুই ধাপ মঞ্চের সব চেয়ারই প্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। চিফ বসেছেন নিচের ধান পিছনের দিকে।

সভা আরম্ভ হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছলেন চেয়ারম্যান। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। পরনে চাপা পাজামা এবং হালকা ছাই রঙের কোট। চোখে কালো, চশমা। চেয়ারম্যানের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নামল তার নিজস্ব দেহরক্ষী।

মাপা পদক্ষেপে চেয়ারম্যান এগিয়ে গেলেন মঞ্চের পিছনে সিড়ির দিকে। ওপরের মঞ্চে উঠে চেয়ারম্যান একধারে চেয়ারে বসলেন। দেহরক্ষী বসল ঠিক তার পিছনে। চেয়ারম্যানের পাশেই রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অনেকেই নমস্কার জানালেন, হাসলেন চেয়ারম্যানকে লক্ষ করে।

চেয়ারম্যান মাঝে মাঝে একটু মাথা নোয়ালেন কিন্তু কারও দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। তার ওষ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ, মুখ পাথরের মতো কঠিন। চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে সোজা চেয়ে রইলেন সামনে।

চিক দেখলেন, চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো তার চারজন বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসার হাজির। একজন উঠে গেল ওপরের বক্তৃতা মঞ্চে। হোমরা চোমরাদের পিছনে আড়াল হয়ে বসল সে। বাকি তিনজন দাঁড়িয়ে রইল নিচে, সিঁড়িতে ওঠার ঠিক মুখে। | মঞ্চের সামনে প্রায় হাত পঞ্চাশ জায়গা অর্ধচন্দ্রাকারে দড়ি দিয়ে ঘেরা। কিছু পুলিশ ভিড় ঠেকাচ্ছে। যাতে ওই ফাকা জায়গায় শ্রোতারা ঢুকে পড়ে। ফাঁকা জায়গাটুকুতে ঘোরাফেরা করছে কিছু পুলিশের লোক। এবং জনা কুড়ি ব্যাজ আঁটা পার্টি ভলানটিয়ার।

একটু কাত হয়ে বসলেন চিফ। যাতে এই নিচু মঞ্চে বসা প্রায় তিরিশজনের ওপর নজর রাখা যায়। আজ এটাই তার কর্তব্য-চেয়ারম্যানের নির্দেশ! চিফের চোখে কালো সান গ্লাস। শুধু রোদের জন্য নয়! যাতে তার দৃষ্টি কেউ না বুঝতে পারে। তিনি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন নির্লিপ্তভাবে।

বক্তৃতা শুরু হল। প্রথম উঠলেন প্রধানমন্ত্রী। উঁচু মঞ্চের ওপর পাঁচ-ছয়টা মাইক্রোফোন বেঁকে চুরে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। মাইকের সামনে দাঁড়ালেন বক্তা। লাউডস্পিকারের সাহায্যে বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার ভাষণ।

চিফের চোখ বার বার আটকে যাচ্ছে এক বিশেষ ব্যক্তির ওপর। সেই অফিসার —যার নাম তিনি সন্দেহ করে জানিয়েছিলেন চেয়ারম্যানকে।

হঠাৎ সেই ব্যক্তিটি ঘাড় ফেরালেন! কয়েকটা চেয়ার তফাতে বসা একজনের সঙ্গে যেন তার চোখাচোখি হল। চিফ আবার দৃষ্টি ফেরালেন প্রধানমন্ত্রীর দিকে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি একজন উঠতি ব্যারিস্টার। মন্ত্রীদের সঙ্গে তার যথেষ্ট খাতির। লোকে ওই আইনজীবীকে চেয়ারম্যানের দলের এক বড় সমর্থক বলে জানে। তবে কি চকিতে একটা প্রশ্ন খেলে যায়। চিফের মনে।।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শেষ। এবার চেয়ারম্যানের পালা। উঠলেন চেয়ারম্যান। ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন মাইকের সামনে। একজন মাইক-মিস্ত্রি ছুটে এসে মাইক্রোফোন ঠিকঠাক করে দিল।

বন্ধুগণ...। -চেয়ারম্যানের গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হল। সহসা সংবিৎ ফিরে এল চিফের। এতক্ষণ তিনি একদৃষ্টে দেখছিলেন চেয়ারম্যানকে। ভুলে গিয়েছিলেন নিজের কাজ। আবার তার নজর ফিরল নিচু মঞ্চের দিকে।

একি! সেই ব্যারিস্টার চেয়ারম্যানের থেকে চোখ সরিয়ে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে আড় চোখে তাকালেন মঞ্চের সামনে ফাকা জমিতে বসা এক পার্টি ভলানটিয়ারের দিকে। ভলানটিয়ারটি অন্যদের থেকে বেশ তফাতে বসেছে। তার দৃষ্টিও আইনজীবীর ওপর। কেমন চোয়াড়ে চেহারা লোকটির।

আইনজীবীর বাঁ হাত উঠল। চশমাটা যেন ঠিক করলেন। ফের হাত নামল। আগের মতো মাথা তুলে তিনি দেখতে লাগলেন চেয়ারম্যানকে।

চিফ লক্ষ করলেন, স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ আঁটা সেই লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে একটু সরে গেল। সে এখন মঞ্চের মুখোমুখি। ওখান থেকে বোধহয় বক্তার পুরো শরীরটা নজরে আসে। লোকটির ডান হাত ঢুকে গেল জামার নিচে। এ চিফ যেন আঁচ করতে পারেন, কী ঘটতে যাচ্ছে। তার স্নায়ু উত্তেজনায় টান টান। কিন্তু ওদিকে দৃষ্টি দেওয়া নিষেধ। চেয়ারম্যানের নির্দেশ। চিফের কাজ আপাতত শুধু মঞ্চের লোকগুলোকে লক্ষ করা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে চিফ তার কর্তব্যে মন দেন।

দুম দুম্...! পরপর দুটো গুলির আওয়াজ। চিফ দেখলেন সেই ভলানটিয়ারটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার হাতের মুঠোয় ধরা পিস্তল ঝকঝক করছে—চেয়ারম্যানের দিকে সোজা তাক করা। দুম্। তৃতীয় গুলির শব্দ হল।

চেয়ারম্যানের দেহ দুলছে। টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন। ক্ষিপ্র চিতার মতো লাফ দিয়ে এগোল তাঁর দেহরক্ষী। জড়িয়ে ধরল পতনোন্মুখ চেয়ারম্যানকে। শুইয়ে দিল মঞ্চে।

সেই বিশাল জনসমুদ্র বুঝি এক পলকের জন্য হতবাক হয়ে গেল। তারপর শুরু হল হাহাকার, অট্ট রোল। ফের দু'বার গুলির আওয়াজ। একজন পুলিশ সার্জেন্ট গুলি করল হত্যাকারীকে। লুটিয়ে পড়ল আততায়ী। চিফ লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গেলেন ওপরের মঞ্চে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

প্লিজ, চেয়ারম্যানের গায়ে কেউ হাত দেবেন না। চিফের গলা শোনা গেল। চিফ, চেয়ারম্যানের দেহরক্ষী এবং তার দু’জন বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসার ঘিরে ফেলেছে ভূলুণ্ঠিত দেহ।

ইন্সপেক্টর সিঁড়ি দিয়ে কাউকে উঠতে দেবেন না।

—চিফের জোরালো গলার নির্দেশ শোনা গেল।

সত্যি, চিৎ হয়ে শোয়া নিস্পন্দ চেয়ারম্যানের বুকের কাছে কোটের কাপড় লাল হয়ে উঠেছে। আর মৃদু লয়ে ওঠা নামা করছে তার বক্ষ।

চিফের বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তাকালেন তাঁর তিন সঙ্গীর দিকে। তাদের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। নিজেকে সামলে নিলেন চিফ। দু-হাত ছড়িয়ে চেয়ারম্যানের দেহের ওপর ফের ঝুঁকে আসা ভিড় ঠেকাতে থাকেন, —সরে যান, সরে যান প্লিজ!

স্ট্রেচার পৌঁছতে দশ সেকেন্ডও লাগেনি। চটপট চেয়ারম্যানকে তুলে স্ট্রেচার ক নিয়ে চলল দুই পুলিশ ইন্সপেক্টর। পাশে পাশে চললেন চিফ ও দেহরক্ষী। স্ট্রেচার উ১ অ্যাম্বুল্যান্সে। পরক্ষণেই স্টার্ট দিল অ্যাম্বুল্যান্স।

সেন্ট্রাল হসপিটালে চললো।ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন চিফ। তিরবেগে ছুটল গাড়ি। দিশেহারা জনগণের বিপুল কলরব ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে।

সেন্ট্রাল হসপিটালের বিরাট কম্পাউন্ড। অ্যাম্বুল্যান্স গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল। প্রধান সার্জন ডঃ চৌধুরি বেরিয়ে আসেন। গাড়ি থামতেই লাফ দিয়ে নামেন চিফ। কাছে গিয়ে বলেন, চেয়ারম্যানকে গুলি করেছে, নিয়ে এসেছি।

গম্ভীর প্রাজ্ঞ চিকিৎসক চৌধুরির কপালে কয়েকটা ভাজ পড়ে। একবার মাথা ঝাকান। তৎক্ষণাৎ পিছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করেন।

চিফকে ইঙ্গিত করেন,—নিয়ে এসো।

একটা আলাদা বাড়ি। একটা বিশেষ ওয়ার্ড। চৌধুরি সেই দিকে চললেন। গাড়ি থেকে স্ট্রেচার নামল চেয়ারম্যানের দেহ সমেত। স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যাওয়া হল ডাক্তারের পিছু পিছু। ডঃ চৌধুরি ছাড়া আর কোনো ডাক্তার, নার্স বা হাসপাতালের কর্মীকে সেই ওয়ার্ডের ভিতরে থাকতে দিলেন না চিফ।

ওয়ার্ডের নিচের তলায় একটা বড় ঘর। সেখানে অপারেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এখানে অপারেশন করা হয়। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকল স্ট্রেচার বাহকরা। একটু বাদেই বেরিয়ে এল ওরা দু'জন

চেয়ারম্যানের স্ত্রীর পৌছতে দশ মিনিটও লাগেনি। গাড়ি থেকে নেমে তিনি পাগলের মতো ছুটে আসেন।

—কোথায়, কোথায় তিনি? ভয় নেই ম্যাডাম। —আশ্বাস দেন চিফ। -উনি বেঁচে আছেন তো?

আছেন বইকি, আসুন।দরজাটা একটু ফাক করলেন চিফ। চেয়ারম্যানের পত্নী ঝড়ের মতো ভিতরে ঢুকলেন। পিছনে গেলেন চিফ।

অপারেশন টেবিলে শায়িত নিথর চেয়ারম্যানের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন তাঁর স্ত্রী। সত্যি প্রাণ আছে তো? চেয়ারম্যানের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছেন প্রফেসর। পাশে দাঁড়িয়ে ডঃ চৌধুরি। একটা প্রবল কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ শুকিয়ে গেল।

ডাক্তারের খানিক পিছনে ও কে দাঁড়িয়ে?

এ যে স্বয়ং চেয়ারম্যান। ঠোটে চাপা হাসি। দেখছেন স্ত্রীকে।

একী! - চেয়ারম্যান-পত্নী থ।

চিনতে পারছ না? —চেয়ারম্যানের কণ্ঠ শান্ত, মৃদু কৌতুক মেশানো।

তা হলে ও কে?—শায়িত দেহটির দিকে অঙ্গুলি দেখান স্ত্রী।

আমার নকল।বললেন চেয়ারম্যান।

-মানে?

মানে রোবট।—আমাদের প্রফেসর বানিয়েছে।

ওঃ! তোমার কিছু হয়নি?—আশঙ্কা মুক্তির উল্লাসে স্ত্রী জড়িয়ে ধরলেন চেয়ারম্যানকে। তার চোখে আনন্দের অশ্রু : কিন্তু আমি যে টিভিতে দেখলাম তুমি সভায় গেলে, বসলে - সব এই রোবট করেছে। আর ওকে চালিয়েছে আমাদের প্রফেসর। হাসপাতালের গায়েই ডঃ চৌধুরির কোয়ার্টারে বসে। যাকে বলে রিমোট কনট্রোল

—বললেন চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে মহা আগ্রহে দেখতে থাকেন তার স্বামীর অবিকল প্রতিমূর্তিকে। কৌতুহলী চিফও ভালো করে দেখেন সেই যন্ত্রমানবকে। এর আগে তাড়াহুড়োয় খুঁটিয়ে দেখা হয়নি।

প্রফেসর রোবটের গায়ের কোটের বোতাম খুলে ফেলেছেন। রোবটের বুক ও শরীরের অনেক জায়গায় রবার ও চামড়ার পুরু আবরণ। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। তার লৌহ অঙ্গ। বুকের রবারের প্যাডিংয়ে বড় বড় ফুটোগুলির ঘায়ে

হয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে নিচে ধাতুর পাত। মূর্তির মুখটা কি দিয়ে করেছে কে জানে। প্লাস্টিক নাকি? কি অদ্ভুত মিল! বুকের এক জায়গা সমানে ওঠা নামা করছে। জামার ওপর থেকে যেন মনে। হবে শ্বাস-প্রশ্বাস।

ফার্স্ট ক্লাস। চমৎকার কাজ করেছে। - প্রফেসর বলেনঃ আঘাত পেয়ে রক্ত বেরুনোটা ঠিক মতো হবে কি না সন্দেহ ছিল। নাঃ-কোনো গন্ডগোল করেনি।

রক্ত?—চিফ অবাক।

ওই হল। লাল জল।—প্রফেসর বেশ বিরক্ত।

চেয়ারম্যানের স্ত্রী আমতা আমতা করেন, সভায় যাওয়ার আগে তুমি যখন আমাকে বলতে এলে, তখনই কি?

না – বললেন চেয়ারম্যান। তখন আসল আমিই ছিলাম। বললাম না, মাথা ধরেছে। চৌধুরির কাছ থেকে ঘুরে যাব। যাওয়ার পথে ডাঃ চৌধুরির বাড়িতেই বদলটা হল। তারপর লুকিয়ে এসে এখানে অপেক্ষা করছিলাম।

আমায় বলেনি কেন? - স্ত্রীর কণ্ঠে অনুযোগ। চেয়ারম্যান চুপ করে থাকেন। -বুঝেছি পাছে বলে ফেলি কাউকে।

কে কে জানত? —এই চিফ। আমার বডি গার্ড। চারজন বিশ্বাসী পুলিশ ইন্সপেক্টর। এবং প্রধানমন্ত্রী। ডঃ চৌধুরি বা প্রফেসরের অ্যাসিস্ট্যান্টের কথা বাদই দিচ্ছি।

ডাক্তার চৌধুরি বলে উঠলেন, গুলি কোথায় লেগেছে দেখেছেন? দুটো হৃদপিণ্ডে। একটা গলায়। আপনার গায়ে সত্যি লাগলে কারও সাধ্যি ছিল না বাঁচায়। চেয়ারম্যান চিফের দিকে ফিরলেন।

-কনগ্রাচুলেশনস। আমার মার্ডার সিনে তোমাদের অভিনয় খাসা হয়েছে। আমি সব দেখেছি টিভিতে। ওই ব্যারিস্টারটিই হয়তো ব্ল্যাক-স্কোয়াডের ব্রেন। এবার চটপট জাল গুটোও। হেঁকে তোলো দলটাকে।

দরজায় টোকা পড়ল। চিফ দরজা খুললেন। একজন ইন্সপেক্টর উকি দিয়ে বলল -স্যার, কয়েকজন মন্ত্রী এসে বসে আছেন। প্রধানমন্ত্রীও এসেছেন। খবর

জানতে চাইছেন।

বলো, চিফ, যথাসাধ্য নিজেকে বিষগ্ন, গম্ভীর করে তোলেন: অপারেশন হচ্ছে। খানিক বাদে দেখতে আসতে পারবেন। প্রেসের লোকদের বলো,—দশ-বারো ঘণ্টা না গেলে চেয়ারম্যানের জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না। —চিফ দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ইন্সপেক্টর চলে গেল। চেয়ারম্যান হাসতে হাসতে বললেন,—ওহে প্রফেসর, এবার রোবটটা সরাও। আর ওহে ডাক্তার, আর দেরি কোরো না, জলদি আমায় ব্যান্ডেজট্যান্ডেজ বেঁধে শুইয়ে দাও। কিছু লোককে তো এই আহত অবস্থায় দর্শন দিতেই হবে! নইলে ব্যাপারটা কেঁচে যাবে না?